৬. মনসবদারি ব্যবস্থা

(ক) উদ্ভব : মোগল বাদশাহদের সৃষ্ট মনসবদারি ব্যবস্থার এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল যার হুবহু সমান্তরাল ভারতের বাইরে পাওয়া যায় না। এই ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। মোরল্যান্ডের মতে এর উদ্ভব মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল সেনাব্যবস্থায় ও তৈমুরলঙের শাসনকালে। আবদুল আজিজ এই ব্যবস্থার মধ্যে ভারতের স্থানীয় প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। সতীশ চন্দ্র চেঙ্গিজ খানের সময়ে এই ব্যবস্থার উৎপত্তির কথা বলেছেন, যখন দশের গুণিতকে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করা হত। সুলতানি সামরিক ব্যবস্থার প্রভাবও এর ওপর পড়েছিল। বাবর ও হুমায়ুনের শাসনকালে মনসবদারি ব্যবস্থার স্বরূপ কেমন ছিল তা জানা যায় না। মনে করা হয় ১৫৬৭ খ্রি.-এ অর্থাৎ আকবর তাঁর শাসনের এগারোতম বছরে এই ব্যবস্থার প্রচলন করেন।

(খ) স্তরভেদ : 'মনসব' শব্দটির অর্থ পদমর্যাদা, এই পদের অধিকারীকে বলা হত 'মনসবদার'। মনসবদারদের মধ্যে পদমর্যাদার ধাপ ও সেই অনুযায়ী বেতনের ক্রমোন্নতি নির্ধারণ করা হত। প্রত্যেক মনসবদারকে পদমর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈনিক, ঘোড়া ও হাতি ভরণপোষণ করতে হত। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল মোট ছেষট্টিটি পদ-মর্যাদার মনসবদারের উল্লেখ করলেও কার্যক্ষেত্রে তেত্রিশটি ধাপের মনসবদার ছিল। সর্বনিম্ন পদমর্যাদার মনসবদারকে কমপক্ষে দশ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে দশ হাজার সৈনিক প্রস্তুত রাখতে হত। সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন সব স্তরের সেনাপতিদের মনসবদার বলা হলেও নিম্নতম স্তর থেকে পাঁচশো সৈনিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপতি পর্যন্ত 'মনসবদার' নামে পরিচিত ছিল। পাঁচশো থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত আমীর ও আড়াই হাজারের অধিক সৈনিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপতিদের আমীর-ই-উমদা বা আমীর-ই-আজম বলা হত। পরবর্তীকালে এক হাজার সৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি সকলকেই মনসবদার বলা হত। সাধারণভাবে মনসবদারের পদে একজনকে নিম্নতম স্তরে যোগ দিতে হত। পরে তার পদোন্নতি হত। কিন্তু মোগল বাদশাহ ইচ্ছা করলে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উচ্চতর পদমর্যাদার মনসবদার নিযুক্ত করতে পারতেন। কোনো স্থানীয় রাজন্য যিনি মোগল বাদশাহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছেন, তিনি এই মর্যাদা লাভ করতেন। সাধারণত পাঁচ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত মনসবগুলি রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হত। আকবরের শাসনকালের শেষদিকে রাজপরিবারের বাইরে কিন্তু বাদশাহের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে মির্জা আজিজ কোকা ও মান সিংহ সাত হাজার পদমর্যাদার মনসব লাভ করেন।

(গ) জাট ও সওয়ার : মনসবের দুটি দিক ছিল —'জাট' ও 'সওয়ার', এ দুটির প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। দীর্ঘদিন পূর্বে ব্লকম্যান দেখিয়েছিলেন জাট হল মনসবদারের অধীনে মোট সৈনিকসংখ্যা ও সওয়ার শুধু অশ্বারোহীর সংখ্যা। উইলিয়াম আরভিন মনে করেন জাট শব্দটির অর্থ মনসবদারের পদমর্যাদার সূচক অশ্বারোহী সেনা ও সওয়ার হল পদমর্যাদার অতিরিক্ত অশ্বারোহী। ইস্তিয়াক হুসেন

কুরেশীর মতে জাট মনসবদারের ব্যক্তিগত পদমর্যাদার দ্যোতক ও সওয়ার বলতে বোঝায় মনসবদারের অধীনস্থ সেনাসংখ্যা। সাম্প্রতিককালে জন রিচার্ডস দেখিয়েছেন জাট বলতে বোঝায় মনসবদারের পদমর্যাদা, বেতন ও তার সরকারি কর্তব্যের পরিধি। সতীশ চন্দ্রের গবেষণা থেকে জানা যায় যে এই বিতর্কের কারণ হল আকবরের শাসনকালে মনসবদারি ব্যবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। ১৫৯৪-৯৫ খ্রি. পর্যন্ত এর রূপ ছিল বিভিন্ন। এই সময়ে পদের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। ১৫৯৫-৯৬ খ্রি.-এ জাট ও সওয়ার, এ দুটি পদের উদ্ভব হয়। তখন থেকে জাট বলতে বোঝাত মনসবদারের পদমর্যাদা ও ব্যক্তিগত বেতন, সওয়ার ছিল মনসবদারের যে সংখ্যক অশ্বারোহী রাখার কথা। এর অর্থ চার হাজার জাট ও তিন হাজার সওয়ারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনসবদার তিন হাজার জাট ও তিন হাজার সওয়ারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনসবদারের চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিল। শিরিন মুসভিও দেখিয়েছেন, একচল্লিশতম শাসনবর্ষে অর্থাৎ ১৫৯৬-৯৭ খ্রি.-এ মনসব দ্বৈত চেহারা নেয়। দুটি সংখ্যার দ্বারা মনসবকে বোঝানো হত। প্রথমটি জাট যার অর্থ ব্যক্তিগত বেতন ও নির্দিষ্ট তালিকা অনুসারে রক্ষিত পশুর সংখ্যা। দ্বিতীয়টি সওয়ার যার অর্থ মনসবদারের অধীনস্থ অশ্বারোহীর সংখ্যা।

(ঘ) নগদি ও জাগীর : জাট ও সওয়ারের যৌথ ভিত্তিতে মনসবদারের বেতন নির্ধারিত হত। যে স্বল্পসংখ্যক মনসবদার নগদ অর্থে বেতন পেতেন তাদের বলা হত 'নগদি'। কিন্তু অধিকাংশ মনসবদারই বেতনের পরিবর্তে 'জাগীর' চাইতেন। অর্থাৎ কোনো এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড যেখান থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব তার বেতনের সমান। কখনো-কখনো কোনো বন্দরও জাগীর হিসাবে প্রদত্ত হত। মনসবদারের বেতন নগদে দেওয়া হবে না জাগীরের মাধ্যমে দেওয়া হবে তা স্থির করার ভার ছিল বাদশাহের ওপর। জাগীর আবার দুরকম হত—তনখা জাগীর ও ওয়াতন জাগীর। প্রথমটি হল বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত জাগীর; দ্বিতীয়টি দেওয়া হত সেইসব হিন্দু রাজন্যবর্গকে যারা আকবরের সময় থেকে মোগল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'ওয়াতন' কথাটির আক্ষরিক অর্থ বাস্তুভিটা। হিন্দু জমিদার ও রাজন্যবর্গ তাদের মনসবের আয় নিজের রাজ্য থেকেই সংগ্রহ করত। মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় মনসব বিতড়নের সঙ্গে তার কোনো সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। ওয়াতন জাগীর ও তার আয় উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করা যেত। এই মনসবদার তথা জাগীরদারদের বদলি করা হত না। এই সুবিধার জন্য পরবর্তীকালে বহু জাগীরদার তাদের 'তনখা' জাগীরকে 'ওয়াতন' জাগীরে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করত। কোনো জাগীর বা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের নির্ধারিত রাজস্বকে বলা হত 'জমা'। কিন্তু অধিকাংশ মনসবদারই এই জমা আদায় করতে পারত না। প্রকৃত সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণকে বলা হত 'হাসিল'। যত দিন যেতে থাকে জমা ও হাসিলের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক মনসবদারই এমন জাগীর লাভ করতে চাইত যেখানে জমা ও হাসিলের পার্থক্য যতদূর সম্ভব কম। সতীশ চন্দ্র মনে করেন পরবর্তীকালে উৎকৃষ্ট জাগীর লাভের জন্য মনসবদারদের দ্বন্দ্ব মোগল দরবারে দল বা গোষ্ঠী গঠনের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। জাগীরভোগী মনসবদারগণ যাতে বেশি ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে না পারে সেইজন্য তাদের তিন-চার বছর অন্তর বদলির নিয়ম ছিল। তা ছাড়া কানুনগো, চৌধুরী, কাজী, ওয়াকিয়ানবিশ প্রভৃতি মোগল রাজকর্মচারীগণ জাগীরদারদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখত।

(ঙ) বিন্যাস ও সামাজিক ভিত্তি : মনসবদারগণ বাদশাহের ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত হলেও নিযুক্তির সময় জন্ম ও বংশগত মর্যাদার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। অভ্যন্তরীণ

বিন্যাস ও সামাজিক ভিত্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মনসবদারদের মধ্যে ছিল ইরানি অর্থাৎ পারস্য থেকে আগত মুসলমান, তুরানি অর্থাৎ মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলমান, আফগান ও ভারতীয় মুসলমান এবং রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি হিন্দু মনসবদার। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল আকবর থেকে আওরঙ্গজেব, সব মোগল বাদশাহই সাম্রাজ্যের মিত্র অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতেন। যখনই কোনো গোষ্ঠী বা জাতি বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে তখনই তাদের 'মনসব' দিয়ে মোগল শাসনব্যবস্থায় সামিল করার চেষ্টা করা হয়েছে। আকবরের রাজপুত নীতি ও আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষদিকে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা মনসবদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি এই নীতির দৃষ্টান্ত। প্রাক্-মোগল যুগের অনেক বড়ো জমিদার ও স্বাধীন হিন্দু রাজা মনসবদার হিসাবে মোগল শাসকশ্রেণিতে সামিল হয়। মোগল শাসকরাও এই বিভিন্ন জাতিভিত্তিক গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখতে উৎসাহী ছিল। উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনে এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপর গোষ্ঠীকে কাজে লাগানো অথবা সাম্রাজ্যের প্রতি কোনো পরিবার বা গোষ্ঠী বা জাতির বংশানুক্রমিক আনুগত্যের ধারা সৃষ্টি করা। উদাহরণস্বরূপ, রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবার ওয়াতন জাগীরের মাধ্যমে মোগল বাদশাহদের কাছে বাঁধা পড়েছিল। গৌতম ভদ্র দেখিয়েছেন, ১৬২০ খ্রি.-এ উচ্চতম পর্যায়ের একশো জন মনসবদারের মধ্যে বাইশ জন ছিল তুরানি, তেত্রিশ জন ইরানি, আট জন আফগান, এগারো জন ভারতীয় মুসলমান, চার জন অন্যস্থান থেকে আগত মুসলমান, একুশ জন রাজপুত, পাঁচ জন মারাঠা ও অন্যান্য হিন্দু একজন। ১৬৫৬ খ্রি. নাগাদ এই অনুপাত ছিল মোটামুটি অপরিবর্তিত। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে অন্যান্য গোষ্ঠীর আনুপাতিক হারের বিশেষ পরিবর্তন না ঘটলেও মারাঠাদের মনসবপ্রাপ্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কারণ দাক্ষিণাত্যের সংগ্রামে জয়লাভের জন্য তিনি মনসব প্রদানের মাধ্যমে মারাঠাসর্দারদের কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

(চ) গঠন : মনসবদারি ব্যবস্থার গঠন সম্পর্কে গৌতম ভদ্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। *প্রথমত,* মনসবদারগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট জাতিভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত হত। যেমন হিন্দুদের মধ্যে থেকে রাজপুত ও পরবর্তীকালে মারাঠা এবং মুসলমানদের মধ্যে থেকে তুরানি ও ইরানি। আবার এদের মধ্যেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও বংশকৌলীন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। ফলে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে মনসবদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। *দ্বিতীয়ত,* প্রত্যেক গোষ্ঠীই তার নিজের লোকেদের বেশি করে মনসব পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। তারা আরও চাইত যে তাদের গোষ্ঠীভুক্ত মনসবদাররা যেন নিরাপদ জাগীর লাভ করে। স্বার্থরক্ষার জন্য এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকত। এর চরম প্রকাশ ঘটত সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সময়। *তৃতীয়ত,* মনসবদারদের একাংশ একটি ভূমিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল যেমন, রাজপুত ও মারাঠা। তা ছাড়া যারা ওয়াতন জাগীরের অধিকারী ছিল তাদের ক্ষেত্রে এ চরিত্রটি স্পষ্ট। তথাকথিত বিদেশি মুসলমান মনসবদারদের কোনো ভূমিকেন্দ্রিক স্বার্থ ছিল না, তারা ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে এদেশের শাসনব্যবস্থায় একটি 'মৌরসী' বন্দোবস্তে সচেষ্ট ছিল। ইরানিরা ছিল পরিবারকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে চেষ্টা করত। কিন্তু তুরানিরা ছিল বেশি সংঘবদ্ধ ও তারা জাতিগত ভিত্তির ওপর গুরুত্ব দিত।

(ছ) সীমাবদ্ধতা : মনসবদারি ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করা যেতে পারে। *প্রথমত,* এই ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমে নানান ধরনের দুর্নীতি দেখা দেয়। মনসবদারগণ অধীনস্থ

সৈনিকদের প্রাপ্য বেতন দিত না। রাষ্ট্র প্রদত্ত উচ্চমানের অশ্ব বিক্রি করে দিয়ে তার পরিবর্তে নিম্নমানের অশ্ব বাহিনীতে রাখা হত। অনেক ক্ষেত্রে মনসবদারগণ প্রয়োজনের চেয়ে কম সংখ্যক অশ্বারোহী তার বাহিনীতে রাখত। এই দুর্নীতি দূর করার জন্য আকবর নিয়মিত সেনাবাহিনী পরিদর্শন এবং 'দাগ' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। *দ্বিতীয়ত,* মোগল সেনাবাহিনীর আনুগত্য বাদশাহের প্রতি ছিল না, ছিল মনসবদারদের প্রতি। একই মনসবদার একই বাহিনীকে বরাবর নেতৃত্ব দিতেন। সৈনিকদের নিয়োগ, শিক্ষা, বেতন প্রদান প্রভৃতি সব দায়িত্বই তাকে পালন করতে হত। কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠনের অভাবে পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। *তৃতীয়ত,* অধীনস্থ সেনার বেতন প্রদানের দায়িত্ব ছিল মনসবদারের। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে জাগীরদারি ব্যবস্থার সংকটের ফলে জাগীরের জমা বা অনুমিত আয় এবং হাসিল বা প্রকৃত আয়ের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকলে মনসবদারদের বেতন অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের পক্ষে নিয়মিত সৈনিকের বেতন প্রদান সম্ভব হত না। অনেক সময় মনসবদার সেনাবাহিনীর বেতনের অংশবিশেষ আত্মসাৎ করত। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। *চতুর্থত,* মনসবদারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোগল দরবারের কোনো না কোনো গোষ্ঠীর প্রতি অনুগত থাকায় দরবারের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মনসবদারদের পারস্পরিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করত। জাগীরদারি সংকট দেখা দিলে উৎকৃষ্ট জাগীর লাভের আশায় এই দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পায়। *পঞ্চমত,* অনেক অসামরিক ব্যক্তি মনসব লাভ করে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হয়। পেশাদারিত্বের অভাবে এ কাজে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারত না।

(জ) মূল্যায়ন : মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে মনসবদারি প্রথার অবদান ছিল ইতিবাচক। এর ফলে একটি কেন্দ্রীভূত, বাদশাহ-নির্ভর, সুনির্বাচিত আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে। মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের পক্ষে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম সমন্বিত অভিজাতবর্গের মধ্যে সংহতিসাধন সম্ভব হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন মোগল রাষ্ট্র আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠত যদি আকবর অভিজাতবর্গকে নগদ টাকায় বেতন দিতেন। সতীশ চন্দ্র মনে করেন অভিজাতবর্গকে মনসব প্রদান করেও তাদের বেতনকে জাগীরের সঙ্গে যুক্ত করা একটি সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত। ভারতের অত্যন্ত জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী স্থানীয় জমিদারদের উপেক্ষা করে রাজস্ব আদায় সম্ভব ছিল না। মনসবদাররূপী অভিজাতবর্গকে জমিদারদের ওপর স্থাপন করে মোগল রাষ্ট্র সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে নিস্তার লাভ করেছিল। মনসবদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিজাতবর্গকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল যাতে কোনো গোষ্ঠী বেশি প্রভাবশালী না হয়ে উঠতে পারে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও সামরিক রীতিনীতির মূল কাঠামোই ছিল এই ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্থায়িত্বের মূলেও এর অবদান অনস্বীকার্য।